নটরডেমের ছোট্ট কুঁজো

শহীদ আহমদ খান (মন্টু)

রাস্তায় রাস্তায় বেহালা বাজায় একটি শীতের সন্ধ্যায় অদ্ভুত গোলাকার টুপি মাথায় বিরাট আলখাল্লা পরা ছোট্ট একজন কুঁজো। আধপাগলা মানুষ। পৃষ্টদেশে তার বিরাট একটি কুঁজ। কথায় কথায় মনে মনে হাসে দাঁত বের করে। বয়স কত হতে পারে তা আন্দাজ করা কঠিন। বিশ বছর হতে পারে আবার পঞ্চাশ ও হতে পারে। তবে তার গাল মসৃণ, অভগ্ন। শরীর স্থুল। আকারে অস্বাভাবিক বেঁটে। বেহালার সুর মিষ্টি হওয়ায় নটরডেমের চলমান জনতার কেউ কেউ তাকে হাত ছানি দিয়ে ডাকে, উপভোগ করে বেহালার মন মাতানো সুর। ইচ্ছে হলে দু' চার জন এক ফ্রাঁ বা দু ফ্রাঁ দেয় তার হাতে, সে তখন বেহালার সুরে আরও রং আরও উম্মাদনা ছড়ায়, দাতাদের প্রতি সে নড করে, বিচিত্র দেঁতো হাসি উপহার দেয়। গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ বৃষ্টি হওয়ায় তীব্র হীম ছড়ায়, বুট পরা ও স্কার্ফ এ মুখ ঢাকা উলেন গাউন পরা, পুরো মৌজা সহ হাই হীল পায়ে মহিলারা দলে দলে ভীড় জমায় এই পাগলা কিম্ভুতকিমাকার লোকটির কান্ড কারখানা বিশেষ করে তার বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী ও অদ্ভুত চেহারা দেখে হেসে গড়িয়ে পড়তে হয়। এই ভয়ঙ্কর শীতকে সহ্য করে যাচ্ছে সম্পূর্ণ নগ্ন পায়ে যা বরফের স্পর্শে কঠিন হয়ে অনুভুতিহীন জড় হয়ে যাচ্ছে কিন্তু সে চলছে তো চলছেই নির্বিকার। কোন কোন কিশোর-কিশোরী পাগল মনে করে ওর প্রতি ঢিল ছুঁড়ছে, হেসে লুটোপাটি খায়, শিশুরা অবাক চোখে তাকায়। কুঁজোর গায়ে ঢিল লাগলে সে চীৎকার করে কেঁদে উঠে, চলমান দুষ্টদের তাড়ায়, মহিলারা শাসন করে ঐ দুষ্টদের,পুরুষেরা চড় মারেন, অগত্যা দুষ্ট বালক-বালিকারা ছুটে পালায়। দয়ালু ব্যাক্তি কিংবা নারী-পুরুষ সবাই চিৎকার করে উঠে অসহায় এই প্রতিবন্ধীকে কেন পীড়ন করছো? নিষ্টুরতা ভাল নয় বিশেষ করে এই মানসিক প্রতিবন্ধীর প্রতি, হাজার হোক সে একজন শিল্পী। দরিদ্র বলে সে এখন রাস্তায় নয়ত বিখ্যাত রঙ্গমঞ্চেও সে একটা স্থান করে নিতে পারত। হয়ত সে আধপাগলা ও নয় তবে মাঝে মাঝে ঐ যে হেসে উঠে সেটা শিল্পীর স্বভাব সুলভ আবেগ ও হতে পারে। তার একটা ভাল গুন হলো সে কারও কাছে কিছু চায় না। ইচ্ছে হলে কেউ এক আধ ফ্রাঁ দিলে কৃতজ্ঞতায় তার চোখে জল টলমল করে উঠে এবং অদ্ভুত দৃষ্টিতে দাতার দিকে তাকায়। তবে মানুষ মাত্রেই দোষে-গুনে মানুষ। আর সে তো আর দশজন স্বাভাবিক মানুষের ভাষায় আধপাগল ওর একটা দোষ হলো কেউ আদর করে পেট ভরে খাওয়ালে হেসে হেসে গড়িয়ে পড়ে এবং যিনি খাওয়ালেন তাকে ঘন ঘন আলিঙ্গন করতে চায়। দাতা তখন ঘেন্নায় একদিকে সরে যান। আর এই ঘৃনায় তার চোখে আবার জলের বন্যা হয়। এই প্রতিবন্ধীরা যারা সত্যিকার অর্থে শিল্পী তারা তখন তার দাতাকে তার এঁটো মুখে চুমো দিয়ে অর্ভ্যর্থনা জানাতে চায় আর তাদের লোলভরা চুমোর স্পর্শে দাতারা চমকে ওঠেন, ঘেন্নায় মুখ ফেরান। সে তো আর জন্তু নয়, জলজ্যান্ত মানুষ, অস্বাভাবিক হয়েছে দারিদ্রের আঘাতে, লাঞ্ছনায়। তাই বলে কৃতজ্ঞতা জানানোর অধিকার বুঝি তার থাকতে নেই, সে একজন পেটুক তাই অনেকদিন না খাওয়া বুভুক্ষুর মত গিলতে থাকে। একদিন

প্রচন্ড ঠান্ডায় বরফ পড়ছে, পাঁজা পাঁজা বরফের টুকরোয় হিমেল হাওয়ায় আকাশ বাতাস প্রচন্ড ঠান্ডার প্রকোপে সন্ধ্যাকে রাত্রির চাইতে জমাট করে দিচ্ছে, ঠিক তখুনি একটি ধনির লাল ইটের বানানো কুটিরে এক চিলতে বারান্দায় এককোণে ঐ কুঁজো জড়সড় হয়ে বেহালার করুন সুর এর মূর্ছনা সৃষ্টি করছে। ঐ মোহনীয় সুর ছন্দে আকৃষ্ট হয়ে গৃহস্বামী লা বুঁর্দোয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে শুধু একটি কম্বল গায়ে ঐ ভুতুড়ে কুঁজোকে দেখে একটু আঁৎকে উঠলেন,তারপরেই ঐ কুঁজোর দাঁত বের করা হাসি দেখে তাকে চিনতে পারলেন। কৃশকায় অদ্ভুত সাদা চামড়ার হাস্যোজ্জ্বল, সুদর্শন দামী পশমী বস্ত্রে সজ্জিত সে ভদ্রলোক ফ্রান্সের একজন সংসদ সদস্য। বয়সে তরুণ বললেও চলে। ভদ্রলোক এই দরিদ্র অর্ধমানব শিল্পীটিকে সহাস্যে বরণ করে নিলেন, মাথা ঢেকে দিলেন একটা পশমী টুপীতে। কুঁজো আরামে চোখ পিট পিট করে তার দিকে তাকিয়ে মহাকৃতজ্ঞতায় আবার দেঁতো হাসি–হেসে তাকে অভিবাদন জানাতে ভুললো না কিন্তু ক্রমে অন্দর মহলের মহিলারা এগিয়ে এলেন। তাদের মধ্যে একজন হৃষ্ট-পুষ্ট সাদা বর্ণের, লং গাউন পরা হাসিখুশী সুন্দরী। ইনি মিসেস বুঁর্দেয়া হবেন। তাঁর পেছনে স্কার্ট পরা স্মার্ট দুটি সুন্দরী তরুণী, মায়ের দুদিকে তারা মাকে জড়িয়ে ধরে মৃদু মৃদু হাসছে। ওদের অবিকল চেহারার একটি বালক এখন বেরিয়ে এল। টাইট জিন্স ও বাদামী জ্যাকেটে অপূর্ব সুন্দর মনে হয়। বালকটি অল্প বয়সী। হ্যাঁ এরা যথাক্রমে তাঁর স্ত্রী, কন্যা এবং পুত্র। এবার এলো পিঁয়রে, সে সম্ভবতঃ কাজের ছেলে। অল্প বয়স, চঞ্চল হাসিখুশি মুখ, চেহারাও মোটামুটি মন্দ নয়। এদের সবার অনুরোধে কুঁজো শিল্পীকে কফি দেওয়া হলো। উষ্ণ কফির বদৌলতে শিল্পীর মনপ্রাণ সঞ্জিবিত হলো, সেই পুরনো স্বভাবগত কৃতজ্ঞতা জানিয়ে দেঁতো হাসি হেসে সুরের খেলায মত্ত হলো শিল্পী। বেহালার করুণ সুর অপূর্ব মূর্ছনায় শ্রোতাদের মোহবিষ্ট করে তুললো। উম্মাদ শিল্পী এখন তন্ময়, আধো তন্দ্রায় নিঝুম,হঠাৎ খুব করুণ সুরে মিষ্টি মিষ্টি কণ্ঠে সে গাইল বেহালার সাথে সাথে, তুমি এলে, চলে গেলে ওগো কেন চলে গেলে ও:হো:হো:কেন চলে গেলে বল বল আমার ছোট্ট লক্ষী প্রিয়ে আহা কেন চলে গেলে! ও:হো:হো:ও:হো হো: যখন সুর ক্ষণিকের জন্য থামল শ্রোতারা তখন যেন যাদুমন্ত্রের প্রভাবে গভীর তন্দ্রার সাগরে ডুবে গেল।হঠাৎ জেগে ওঠে মিনতি জানালো,আবার আবার একটু গাও না গো! কিন্তু গৃহস্বামী–ও তার প্রিয়তমা স্ত্রী ওদের থামালেন। বললেন, ও গেয়েছে, এবার খাওয়া দাওয়া হোক্ তখন না হয় আবার গাইবে। এখন ও ক্লান্ত, প্রত্যেকে এখন ডাইনিং টেবিলে বসলেন, তারা খাওয়া শুরু করার আগেই শিল্পী গো গ্রাসে খাওয়া আরম্ভ করলো। ভাজা মাংস, ফ্রাইড রাইচ,কারী ও চিংড়ী ভাজা ও গ্রীল খাওয়া দেখে মেয়েরা মিটি মিটি হাসছে। তারা এখন মাত্র খাওয়া শুরু করেছে কিন্তু বড়রা চোখের ইশারায় নিষেধ করলেন ওদের। কারণ হাসলে শিল্পী মনে কষ্ট পাবে, এবার ড্রিংকস, ফ্রান্সের বিখ্যাত সুরা স্যাম্পেন কিন্তু ও কি শিল্পীর চোখ বুজে আসছে কেন? কেন ও ছটফট করছে? মনে হচ্ছে এখনি ওর নিঃশ্বাস বন্ধ হবে। হায় হায় কেন এমন হলো? প্রত্যেকেই উদ্বিগ্ন, গৃহস্বামী তাকে স্পর্শ করলেন, সে শীতল, সাংঘাতিক শীতল, নিঝুম, চোখ দুটি পুরোপুরী বন্ধ, গলায় ঘড় ঘড় শব্দ হচ্ছে। একটু পরেই সে নেতিয়ে পড়লো, অসাড় ,নিস্পন্দ,বাকহীন,আতঙ্কে শিউড়ে উঠলেন গৃহস্বামী আর সবাই ভয়ে বিস্ফারিত হলো। এ কি

এদেশের আইন যে সাংঘাতিক কড়া, এটা হত্যাকান্ড প্রমানিত হলে এবং লাশ এখানে পাওয়া গেলে সবার মাথা কাটা যাবে যে গিলোটিনে (ধারালো অস্ত্রে)। উফ কি সাংঘাতিক! যাই হোক খুব তাড়াতাড়ি একটা সিদ্ধান্ত নিলেন গৃহস্বামী। অত্যন্ত সাহসের সাথে ওকে চাদরে জড়িয়ে কাঁধে নিলেন তিনি। সাথে নিলেন তার ছেলেকে। ফিস্‌ফিসিয়ে বললেন 'মারিউস চল আমরা এগুই।' সেই হিমাচ্ছন্ন প্রায় মধ্য রাত্রিতে প্রচন্ড শীতে প্রায় জমে যাওয়া অসহ্য কাঁপুনী ওদের দেহে, তা অগ্রাহ্য করে ভারী কোট ও বুট কোনরকম গায়ে ও পায়ে পরে তারা যাত্রা শুরু করলেন। মেয়েরা হতভম্ব। তারা প্রানপনে বাধা দেওয়া সত্ত্বেও ওরা চলে গেলেন চোখের নিমেষে। চলার আর শেষ নেই। আর শিল্পীর ওজন কম নয়, গৃহস্বামী ওকে আর বহন করতে পারছেন না, বিরাট কুঁজ শিল্পীর দেহকে আরও ভারী করে তুলেছে। একসময় তারা বহু দূরে এসে গেলেন একটি নির্জন কুটিরের প্রান্তে। চারিদিকে বন, বাগান, আর একটি স্রোতস্বিনী সংলগ্ন সুন্দর ছিমছাম কুটির। এর দ্রুতগতিতে এরা ছুটে চললেন নিজেদের আস্তানায়। এটা ছিল একজন নামজাদা না হলেও একজন ভাল ডাক্তারের বাড়ি। এক ছেলে এক মেয়ে আর স্ত্রী নিয়ে ছিমছাম সুন্দর সংসার। ছেলে জ্যাক, মেয়ে কুরী দুজনাই ছাত্র-ছাত্রী। ডাক্তার জাভেয়র এদের মা-বাবা। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে সখের বাগানে ঘুরে বেড়ানো ডাক্তারের অভ্যেস কিন্তু হঠাৎ এ কি? কফিন নয়ত? কেউ শত্রুতা করেছে কি? হত্যার পর লাশ এখানে রেখে হত্যাকারী পালিয়েছে কি? এরকম নিজেকে নিজের প্রশ্ন করেছেন তিনি। শেষে ঠিক করলেন নাহ্ সময় ব্যায়ে কাজ নেই, পুলিশের খবর দেওয়ার আগে একবার দেখতে হয়। বলা বাহুল্য তিনি একজন ডাক্তার। লাশ তার জন্য নতুন নয়। তিনি সার্জন ও বটে। ঝটপট চাদর তুলে দেখলেন শ্মশ্রুগুম্ফে ভরা এলোচুলে একটা বেঁটে মানুষ, আবার পিঠে ও বিরাট কুঁজ। দৌড়ে ভিতরে ঢুকে তিনি ডাক্তারী ব্যাগ নিয়ে আসলেন। তখনও বাসায় সবাই ঘুমে। তাদের তিনি জাগালেন না, মেয়েরা মিছেমিছি ঘুম ভেঙ্গে এ সব দেখে চিৎকার করবে। তিনি খুব সাবধানে ষ্টেথোর সাহায্যে ওর বুকের কম্পন পরীক্ষা করলেন। নিঃশ্বাস উঠছে তবে খুব ক্ষীণ। গলার দিকে একটু স্ফীত, আবার মৃদু ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে। চকিতে তিনি ওর মুখ হাঁ করালেন। ছোট টর্চ জ্বালালেন, এর রশ্মি ভয়ঙ্কর তীব্র। আলোর ঝলকানিতে তিনি দেখতে পেলেন লোকটার জিহ্বার শেষ প্রান্তে কি জানি সাদা একটি জিনিষ দেখা যায়। তক্ষুনি তিনি ডাক্তারী যন্ত্রের সাহায্যে সাদা বস্তুটিকে টান দিলেন, লোকটা চিৎকার করতে চাইল, পারলোনা ঘড়ঘড় শব্দ ছাড়া কিছু বেরোলোনা কণ্ঠ থেকে। এবার ডাক্তার ঠিক জায়গাটিতে অর্থাৎ কণ্ঠের মুখে কি জানি ঢেলে দিলেন কয়েক ফোঁটা, মুহুর্তে যন্ত্রটি দিয়ে তিনি সাদা বস্তুটিকে পরিমিত চাপ দিলেন, চাপের ফলে বেরিয়ে এলো, একি! অদ্ভুত একটি হাড়, লোকটির নিঃশ্বাস এখন দ্রুততর হলো, ক্রমে নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হলো ও ঘড়ঘড় শব্দ বন্ধ হলো। ঘড়ি ধরা মিনিট দশেকের মধ্যে লোকটির চোখ পিট পিট করে তাকালো আর সেই পুরনো দেঁতো হাসি উপহার দিল। ডাক্তার এখন তাকে চিনতে পারছেন সে ঐ পাগলা কুঁজো বেহালা বাদক। শহরের সবাই তাকে চিনে। ততক্ষন ঘরের সবাই জেগে উঠেছে, বেলা বেশ হয়েছে, দশটার কম নয়, কুয়াশার চারিদিকে ঢেকে থাকায় রোদ দেখা যাচ্ছে না। ডাক্তার গৃহিনী ও তার মেয়ে এবং ছেলে বাইরে

বেড়াতে এসে এই দৃশ্য দেখে হতবাক। কারণ কুঁজো তখনও চাদরে ঢাকা, তারা ওকে মৃত মনে করে শিউরে উঠে চিৎকার দিতে চাইল, ডাক্তার ইশারায় বারণ করলেন। এরপর সবাই মিলে পাগলটাকে ভেতরে নিয়ে এল, সে তখন একটু একটু হাঁটছে, তার ব্যাগে তখনও বেহালা ঝুলানো। ডাক্তারের নির্দেশে ওরা ওকে গরম চকোলেট কফি পান করালেন, এরপর এক পেগ শ্যাম্পেন (ফরাসী উৎকৃষ্ট মদ)। সে এখন মোটামুটি সুস্থ। তাকে সবাই প্রশ্ন করলো কেন তার এ অবস্থা। সে শুধু হাসে আর বলে হিঃ হিঃ জানি না। যাই হোক আরও একটু সুস্থ হয়ে উঠতে ডাক্তার লোকটাকে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। আবার লোকটা চলছে প্রশস্ত রাজপথে হাসিমুখে বেহালা বাজাতে বাজাতে, বেহালায় তখন উচ্ছ্বল গানের সুর, আনন্দের সুর,আবার চলমান জনতা ঘিরে ধরে নতুন পোষাক পরা আনন্দ ভরপুর এই অর্ধ পাগল কুঁজো শিল্পীকে কেন ঘিরে ধরবে না সে যে সবাইকে আনন্দ দিতে জানে সুরের অপূর্ব মূর্ছনায়। হোক্‌না সে উম্মাদ কুঁজো, বেঁটে কদাকার কিন্তু তার ভেতরের মানুষটা যে নির্দোষ, নিস্কলঙ্ক অতি সুন্দর শিল্প মনের অধিকারী। তাই সবাই তাকে ঘিরে ধরে, ভালবাসায় সিক্ত করে, গুটিকতক দুষ্ট মনোবৃত্তির মানুষ যারা অভিশপ্ত এবং মানবাত্মাকে সম্মান দেয় না বা দিতে জানে না তারা তাকে নিষ্টুরতার সাথে পাথর বৃষ্টিতে রক্তাক্ত করে। তারা যেহেতু পাশবিক মনোবৃত্তির সুতরাং অসহায়ের রক্ত ঝরিয়ে তারা নিষ্ঠুর আনন্দে আত্মহারা হয়ে হাততালি দেবে এটা বিচিত্র কিছু নয়! যুগে যুগে নির্দোষ উন্নাসিকেরা এইভাবে লাঞ্ছিত হয়ে আসছে পিশাচের হাতে, যদিও এসব উন্নাসিকেরা অনেক ক্ষেত্রে সুন্দর মনের অধিকারী, শিল্পী বা আরও মহৎ ব্যাক্তি হিসেবে মানুষের দেওয়া অপমান, লাঞ্ছনাকে অগ্রাহ্য করে অসীম ধৈর্যের সাথে মানুষকে শিখিয়ে গেছেন যে প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব বর্তমান। তাই মানুষ উন্নাসিক হোক, বিকৃত হোক, কানা কুঁজো হোক তবুও তাকে ঘৃণা বা উপহাস করতে নেই। তাই মহাকবির বাণীতে তাঁর ভাষায় বলছি–হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।' যুগে যুগে আবির্ভূত মহাপুরুষদের বাণীতে এ মহান প্রচার অন্ধজগৎকে আলোর পথে পরিচালিত করেছে যা অনুসরণে মহাকবি এই বাণী দিলেন অন্ধজগৎ – কে ॥

২৩/০২/২০০৬

পরিচিতি ঃ **শহীদ আহমদ খান (মন্টু)**
এডভাইজার, খান প্রিন্টার্স, নজির আহমদ চৌধুরী রোড,
চেয়ারম্যান গলি, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।